হাড়

লোহার ফটকের ওপারে দুটো কলারদর্শন কুকুর। যে দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকাচ্ছিল সেটা বন্ধুত্ববাচক নয়। এক পা এগিয়ে আবার তিন পা পিছিয়ে গেলাম।

ফটকের বাইরে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফিরে যাব? শ্যামবাজার থেকে এতদূর পয়সা খরচ করে এসে দুটো কুকুরের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে যাব।

রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জি—'ইন'-ই থো বটে। কিন্তু ডাকি কাকে? দারোয়ানের ঘরটা বন্ধ। ওদিকে বাগানের একপাশে সেখানে চমৎকার গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুটেছে, একটা মালি ঝাঁজরি হাতে সেখানে কী যেন কাজ করছিল। আমাকে একবারও তার চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। না পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কী করি। চাকরির উমেদার। বহু কষ্টে পরিচয়পত্র মিলেছে একখানা—পিতৃবন্ধু বলে কথাও শুনেছিলাম। রায়বাহাদুর একটা কলমের খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা। কাজেই এক সময়ে আমাকে দেখে হয়তো কারো কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠবে, আপাতত সেই শুভ মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করা যাক। গেটের সামনে পায়চারি শুরু করে দিলাম।

প্রসারিত রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। মোটর-ট্রাম-মানুষের অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা। মাথার ওপর এরোপ্লেনের শব্দ—জাপানি-দস্যুর আক্রমণ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে। দি লায়ন হ্যাজ উইংস!

—গর্-র-র-র্—

পেছনে ক্রুদ্ধ গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখি একটা মহাকায় কুকুর চলে এসেছে একেবারে গেট পর্যন্ত। চোখ দুটোতে সোনালি আগুন জ্বলজ্বল করছে—ঝকে উঠেছে দুটো নতুন গিনির মতো। কয়েকটা হিংস্র দন্ত বিকাশ করে আবার বললেন—গর্-র-র-র্—

লক্ষণ সুবিধের নয়। 'শকটং পঞ্চ হস্তেন'—শাস্ত্রকারেরা বোধহয় কুকুরের মহিমা টের পাননি তখনো। গেটের সামনে থেকে আরো দু'পা সরে এলাম। আশা ছাড়তে পারছি না। উমেদারের আশা অন্তত।

একটু দূরে মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয়—বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জল জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রোন্টের ময়লা জল। সহানুভূতি আসে না, বেদনা আসে না, শুধু একটা অহেতুক আশঙ্কায় মনটা শিউরে ওঠে শিরশির করে। দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে—এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর এক খাবলা বাজরাই কি যথেষ্ট এর পক্ষে? অথবা আরো বেশি—আরো বেশি—এমনকি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়িগুলো পর্যন্ত?

বাতাসের একটা গন্ধের তরঙ্গ এল। না, বুভুক্ষুদের নোংরা গন্ধ নয়, গ্র্যান্ডিফ্লোরার উগ্রমধুর এক ঝলক সুরভি। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচ দেওয়া জানালায় সিলকের পর্দা, চীনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড।

কাকে চাই আপনার?

মিষ্টি মধুর কণ্ঠ—ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধের সঙ্গে যেন তার মিল আছে। তাকিয়ে দেখি গেটের ওপারে কোথা থেকে একটি ষোড়শী এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দীর্ঘকায়া একটি গৌরাঙ্গী মেয়ে। ট্রাউজার পরা, সঙ্গে ছোট একটি সাইকেল। আবার প্রশ্ন হলো : কী দরকার? কী দরকার?—এই চুপ!

গর্জন বন্ধ করে শান্ত হয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। মেয়েটির মুখের দিকে মুখ তুলে প্রসাদকাঙ্ক্ষীর মতো লুব্ধভাবে লেজ নাড়তে লাগল।

ভীত শুকনো গলায় বললাম, রায়বাহাদুর আছেন?

বাবা? হাঁ আছেন বই-কি।

—একটু দেখা করা সম্ভব হবে?

—আসুন।

—লোহার ফটক খুলে গেল। অ্যাসফেল্টের রাস্তায় এবার বিস্তৃত আমন্ত্রণ। উজ্জ্বল মসৃণ পথ—আমার তালি দেওয়া জুতোটার চাইতে অনেক বেশি পরিষ্কার।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কি পড়ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ওঠে বসলেন।

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলো! ভদ্রলোক বললেন, কী দরকার?

স্পন্দিত বুকে পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিয়ে আসন নিলাম।

রায়বাহাদুর খামখানা খুলে মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে আর আমি মাঝে মাঝে ভীরু দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভারী গোল একখানা

মুখ—টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাডপ্রেসার কথাটার ডাক্তারি সংজ্ঞা জানি না, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেসারে ভুগছেন।

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। কোথায় একটি ঘড়ি টিক টিক করছে। হাওয়ায় উড়ছে রায়বাহাদুর কিমানোর হাতাটা। বাঁ হাতের অনামিকায় অমন জ্বলজ্বল করছে কী ওটা? হীরাই নিশ্চয়।

চিঠি পড়া শেষ করে রায়বাহাদুর আমার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি শান্ত আর উদার! অচেতন মন থেকে কেমন একটা আশ্বাস যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো হয়েও যেতে পারে চাকরিটা।

—প্রমথের ছেলে তুমি? আরে তা হলে তো তুমি আমার নিজের লোক। তোমার বাবা আর আমি—ফরিদপুরে ঈশান ইস্কুলে একসঙ্গেই পড়েছিলাম। প্রমথ? ও, হি ওয়াজ ও নাইস বয়।

আমি বিনয়ে মাথা নত করে রইলাম।

—তোমার বাবা যখন রেজিগনেশন দেয় সে খবর আমি পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ও স্পিরিটেড, অন্যায় কখনো সইতে পারতো না। নইলে এতো সহজে অমন চাকরি ছেড়ে দিল। অ্যান, এক্সসেপশনাল বয় হি ওয়াজ!

নিরুত্তোর হয়ে থাকা ছাড়া আর কী করা যায়! পিতৃ-প্রশংসায় বিনীত হয়ে থাকাই উচিত ভক্ত সন্তানের।

—তারপর, চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এমএ পাস করে কেরানীগিরির উমেদারী করছো? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে; চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।

বললাম, নানারকম অসুবিধে আছে, অনেককে দেখাশোনা করতে হয়। তা ছাড়া একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে—

—অনিশ্চিত।—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়বাহাদুরের দৃষ্টি : জীবনটাই তো অনিশ্চিত হে ছোকরা। আমিও একদিন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে। সিঙ্গাপুরে কাটিয়েছি দশ বৎসর, ভেসে গেছি হাওয়াই, ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন, মিকাদেরীর দেশ জাপানে। পৃথিবীটাকে চোখমেলে না দেখলে বাঁচার অর্থই নেই কোনো।

—তা বটে! আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলাম। রায়বাহাদুরের কথাগুলো ভালো, অত্যন্ত মূল্যবান। অ্যাডভেঞ্চার নেই বলেই তো বাঙালির সমস্ত প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ভালো কথা জানলেই কি ভালো হওয়া যায়? যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোটবিঘ্নিত ফেনিল সমুদ্রে-নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাকে কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। তা ছাড়া পৈতৃক অর্থে প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়ানো,

আর বোমারু ঈগলের মৃত্যুচঞ্চুর তলায় দূরবীণের শাণিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রতীক্ষা করা—আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে রায়বাহাদুর বললেন—কত জায়গাতে ঘুরেছি আমি। হাওয়াইয়ের সেই হুলোহুলো ড্যান্স, স্টিভনশন-ব্যালেন্টইনের প্রবাল-দ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা। বিচিত্র সব কালেকশান আমার, দেখবে?

কালেকশান দেখার মতো মনের অবস্থা নয়। পঁচিশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশন আছে একটা, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরকে চটানো চলে না, তার কলমের একটা আঁচড়েই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা।

উঠে জোরালো একটি ইলেকট্রিকের আলো জ্বালালেন রায়বাহাদুর। তারপর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী খুললেন তিনি। তাঁর ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে এল কালো ভেলভেটের একটা বাক্স, সেটা এনে রাখলেন আমার সামনে। ঢাকনাটা খুলে বললেন, দেখছো?

দেখলাম, কিন্তু এ কী কালেকশান! কতকগুলো ছোট বড় হাড়ের টুকরো। প্রত্যেকটার সঙ্গে একখানি করে নম্বরের ছোট লেবেল ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, হাড় নাকি এগুলো?

—হাঁ, হাড় বই-কি।—আমার মুখোমুখি হয়ে বসলেন রায়বাহাদুর: কিন্তু সাধারণ হাড় নয়। এদের প্রত্যেকের বিস্তৃত পরিচয় আছে, অমানুষিক সব গুণ আছে। সমস্ত প্যাসিফিক ঘুরে আমি এদের সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওয়ান মিনিট প্লীজ–সুষি মাদার?

সুষ্যি ঘরে ডুকলো। সেই মেয়েটি।

—ডাকছো বাপী?

—আমাদের চা—

—বলছি এখুনি—নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত তনু-দেহটিকে একটা দোলা দিয়ে সুষি বেরিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর আবার আমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর দামি দুর্লভ একখণ্ড হীরার মতো পরম যত্নে এক টুকরো হাড় তুলে আনলেন বাক্স থেকে।

—বলতে পারো, কিসের হাড় এটা?

নিশ্চয়ই ভয়ানক একটা কিছুর। ভয়ে ভয়ে বললাম, গরিলার?

—ননসেন্স।—রায়বাহাদুর প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন আমাকে : প্রশান্ত মহাসাগরে গরিলা থাকে শুনেছ কখনো? এটা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় কোনো আদিমানবের চোয়ালের হাড়।

—রোডেশিয়ান?

হ্যাঁ, রোডেশিয়ান।—রায়বাহাদুর স্পষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন : রোডেশিয়ানের নাম জানো না? অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক গরিলা, মাত্র কয়েকশো বছর আগেও পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল তাদের।

বোকার মতো বললাম, আজ্ঞে হাঁ, জানি বই-কি।—অবচেতন মনের কাছে সুরটা যেন বাজলো মোসাহেবীর মতো। কিন্তু উমেদারী করতে হলে মোসাহেবী তো অপরিহার্য।

—এটা সেই রোডেশিয়ান ক্লাসের কোনো জীবের হাড়—মানুষেরই বলতে পারো। কোথায় পেরেছি জানো? মিন্ডানাও দ্বীপে কাটাবাটু বলে জায়গা আছে একটা। তারই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের সর্দারের কাছ থেকে এই হাড় আমি কিনেছিলাম। কত দাম দিয়ে কিনেছিলাম বলতে পারবে?

ধমক খাওয়ার ভয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে সাহস হলো না। বললাম, অনেক দাম হবে নিশ্চয়।

—নিশ্চয়। পাঁচ হাজার টাকা।

—পাঁচ হাজার টাকা!—রায়বাহাদুরের হাতের তেলোয় ওই বস্তুটির দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চ্যাপটা আকৃতির, অনেকটা ছুরির ফলার মতো দেখতে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় হরিদ্রাভ রং ধরেছে, রায়বাহাদুরের বিকটকায় কুকুরগুলোর নোংরা দাঁতের মতো।

—খুব বেশি মনে হচ্ছে? মোটেই নয়। এর ইতিহাস শুনলে তুমি—দূর থেকে একটা তীব্র কোলাহলে বাকি কথাগুলো উড়ে গেল মুহূর্তে। বাইরের পথে ট্রামের শব্দ, ঘরের ঘড়িটার টিকটিক করে ছন্দোবদ্ধ সুর-ঝঙ্কার—সবকিছুকে ছাড়িয়ে সেই কোলাহল কানে এসে আঘাত করল। কিন্তু কলরবটা অপরিচিত নয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে ক্ষুধার্ত জনতার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুরের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল : পার্কের ওই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধহয় খাবারদাবার কিছু মিলিছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।

সবুজ পর্দা সরিয়ে একটা ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চা খাবার। পিতৃদেবের বন্ধুত্বটা রায়বাহাদুর সত্যি সত্যিই মনে করে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। এ যাত্রা বোধহয় হয়েই যাবে চাকরিটা।

রায়বাহাদুর বললেন, নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট কাছে টেনে নিলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে বিলক্ষণ। বেলা এগারোটায় মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে এখন। এর মধ্যে এক কাপ চা খাইনি, একটা সিগারেট পর্যন্ত নয়।

দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সচিৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে

গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়া জন্য অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্রভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোনো কেক কাটছি—উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীষ চিবানোর মতো দাঁতের একটুখানি বিলাসিতা মাত্র। চায়ের কাপে এমনভাবে চুমুক দিচ্ছি যে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না—ঠোঁটের আগায় আলগাভাবে চুম্বকের মতো একটু ছোঁয়াচ লাগছে। গপগপ করে গেলা, হুসহাস করে শব্দ করা—জীবনের সমস্ত এসথেটিক আনন্দ তাতে বিস্বাদ হয়ে যায়। খাওয়াটা যেমন স্থূল, তেমনি গ্রাম্য হয়ে ওঠে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রায়বাহাদুর বলেন—হাঁ কী বলছিলাম? এই হাড়খানা। বড় বিচিত্রভাবে সংগ্রহ করেছিলাম এটাকে। ওখানকার সর্দার এখানাকে পরত মুকুটে। কারণ, যার মাথায় এই হাড় থাকবে সে হবে যুদ্ধে অজেয়—শত্রুর হাজার অস্ত্রাঘাতও তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। ওদের কোনো এক যাদুকর পুরোহিত একে মন্ত্রসিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে আমি এটাকে যোগাড় করি, কিউরিয়োর অপূর্ব নমুনা হিসেব। ওয়েল ইয়াংম্যান যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করো তুমি?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। মনোহরপুকুর পার্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন চিৎকার, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করি বই-কি। শস্যশ্যামল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলা—হরিবর্মদেব, শশাঙ্ক নরেন্দ্রের তলোয়ার ঝলসিত বাংলা। কার মন্ত্রবলে সেই বাংলা থেকে উঠে এল এই প্রেতের দল? মাঠভরা ফসল কার মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি কণাও পড়ে রইল না কোনোখানে? যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস না করে উপায় কী।

বললাম, হাঁ, ইয়ে—কত রকম ব্যাপারই তো আছে, বিজ্ঞান দিয়ে তার—

—দেয়ার ইউ আর—দু'নম্বরের হাড়খানা হাতে তুলে রায়বাহাদুর বললেন, আমিও সেই কথাই বলছি। স্টিভেনশনের সেই সব গল্পগুলো পড়োনি? দেখতে দেখতে একটা সাধারণ মানুষ সাড়ে তিনশো হাত লম্বা হয়ে ওঠে, বড় বড় পা ফেলে পার হয়ে যায় সমুদ্র, আর জলের তলায় নিমজ্জিত সব নাবিকদের কঙ্কালগুলো সেই অতিকায় পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যায় মড় মড় করে? তাহিতির আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ রক্তের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হলকা বয়ে যায়, আকাশ থেকে যে বৃষ্টি ধারা নেমে আসে, তা জল নয়, টকটকে তাজা রক্তের ফোঁটা। আর কেমন করে জানো! এই রকম ঠিক এমনি একখানা হাড়ের গুণে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমি সেই হাড়ের দিকে তাকালাম। অন্য সময়ে হলে এসব কথা গঞ্জিকার মহিমাপ্রসূত মনে হতো, কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন এই

বিচিত্র কাহিনীর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। গ্র্যান্ডিফ্লোরা আর রায়বাহাদুরের পাইপ থেকে কড়া তামাকের গন্ধ। হাওয়ায় জানালার নীল পর্দাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তরঙ্গমালার মতো দোল খাচ্ছে। রায়বাহাদুরকে মনে হলো যেন অপরিচিত দেশের সেই অদ্ভুতকর্মা যাদুকর—তাঁর হাতের হাড়ে মুহূর্তে ভেলকি লাগাতে পারে!

—পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পুজো করে কুমারী মেয়েকে বলি দেয় ওরা। তারপর তাকে পুড়িয়ে হাড়গুলো যা থাকে তা মাটির তলায় পুঁতে দেয়। সাত বছর পরে মহাসমারোহে সে হাড় তুলে আনা হয়, ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। সে হাড় যে জলের তলা থেকে তুলে আনতে পারে সেই হয় এই যাদুবিদ্যার মালিক। যত প্রেতাত্মা সব তার অনুচর হয় তখন, সে যা খুশি তাই করতে পারে। তাল তাল পাথর তার ক্ষমতায় সোনা হয়ে যায়, তার আদেশে লতা-পাতাগুলো অজগর সাপ হয়ে ফণা তুলতে পারে—

আমি বসে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। রায়বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলছে, হাতের হীরাটা জ্বলছে, জ্বলছে বলি-দেওয়া সেই কুমারী মেয়ের হাড়খানা, নীল পর্দাগুলো জ্বলছে, আগুনের মতো জ্বলছে অতি তীব্র শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা। সমস্ত ঘরটা যেন জ্বলন্ত। আর সেই জ্বলন্ত ঘরের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ, পাইপের তামাকের গন্ধ, ভেলভেটের বাক্স থেকে উঠে আসা কি একটা ঔষধগন্ধ। মনে হলো যেন আমার সামনে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে তার লকলকে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে একতাল কাঁচা মাংস—তামাটে ধোঁয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দগ্ধ মেদ আর চুলের অত্যুগ্র দুর্গন্ধে যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

...চাট্টি ভাত দাও মা...একটুখানি ফ্যা...

মোহ ভেঙে গেল মুহূর্তে। তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়। বুভুক্ষার লেলিহান শিখায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে বিরাম নেই ট্রাফিকের। ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, চলেছে স্বপ্নসম লোকযাত্রা। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ওই চিৎকার এসে ঘা দিচ্ছে কানে। কী অস্বাভাবিক গলার জোর, কী দানবীয় আর্তনাদ! মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওই রকম গগনভেদী হয়ে ওঠে!

রায়বাহাদুর আবার ভ্রুকুঞ্চিত করলেন বিরক্তিতে। শব্দটা তারও কানে এসেছে। বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এই মুহূর্তে ভুলে যাওয়ার জো নেই, তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোথায় তাহিতি-ম্যানিলা হনোলুলুর যাদু-রাজ্য, আর কোথায়—

কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল তার দরজায় দুটো করালদর্শন কুকুর। নতুন গিনির মতো ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ মেলে তারা পাহারা দিচ্ছে, কোনো অনাহুত-রবাহুতের সাধ্য নেই তাদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ

করে। এ যাদুমন্ত্রের দেশ। বাইরের পৃথিবীতে যত ক্ষুধাই উত্তাল হয়ে উঠুক না কেন, এখানকার ফুলের গন্ধ, রায়বাহাদুরের হাতের জ্বলজ্বলে হীরাখানা অথবা নীল পর্দার গায়ে বিদ্যুতের আলো-কোনোখানে তার এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা দেবে না।

—এই হাড়গুলো আমার বহু যত্নের কালেকশান। অনেক আছে, প্রত্যেকটারই এই রকম সমস্ত গুণ। প্যাসিফিক ঘুরার সময় এইগুলো সংগ্রহ করাই 'হবি' ছিল আমার। ভাবছি এই নিয়ে বই লিখব একখানা।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কেবল মনে হচ্ছে একটা অমানুষিক গন্ধ আসছে নাকে, আগুনের গন্ধ, পোড়া মাংসের গন্ধ। পালাতে পারলে যেন বেঁচে যাই। কিন্তু চাকরিটা! রায়বাহাদুরের কলমের এক আঁচড়, মাত্র একটি আঁচড়েই সেটা হয়ে যেতে পারে।

—হাড় জোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্রগুলো পাইনি। সেগুলো অনধিকারীকে শেখায় না ওরা। যদি যাওয়া যেত—রায়বাহাদুর হাসলেন—যদি পাওয়া যেত তা হলে এতদিনে কত কী অঘটন ঘটিয়ে বসতাম কে জানে। হয়তো সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই বদলে যেত মন্ত্রবলে। আর এই যে ছোট্ট দাঁতটা দেখছ, এটা—

অস্থিরাজ্য থেকে যখন মুক্তি পেলাম, রাত তখন নটার কাছাকাছি।

উপসংহারে রায়বাহাদুর বললেন, ইয়াংম্যান, কেন পঞ্চাশ ষাট টাকার চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছো? কী কারেজিয়াস? ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো; নাম লেখাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে। সামনে পড়ে রয়েছে পৃথিবী। কেরানীগিরি করে কী হবে?—

ক্লান্ত নিরাশ গলায় বললাম, তা বটে, কিন্তু চাকরিটা পেলে—

—ওই চাকরি চাকরি করেই উচ্ছন্ন গেল দেশটা।—রায়বাহাদুর উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন : তুমি প্রমথের ছেলে। তোমার বাবা, হোয়াট সপ্লেননডিড বয় হি ওয়াজ! বাপের নাম রাখতে হবে তোমাকে। একটা নগণ্য কলম পেশার চাকরির মধ্যে নিজের সমস্ত ফিউচারটাকে নষ্ট করে দিও না। আই উইশ ইউ অল সাকসেস ইন লাইফ। আচ্ছা, গুড নাইট—

—নমস্কার—

ব্ল্যাক-আউটের আলোহীন পথ। উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করে ভারী পায়ে চললাম এগিয়ে। টুশনিতে আজ আর যাওয়া হলো না। ছাত্রের বাবা মহাজন লোক, পাই পয়সা বাজে খরচ করে না। একদিনের মাইনে কেটে নেওয়া বিচিত্র নয়।

সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন চারজন অমানুষিক মানুষ তার ভেতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি—নতুন

প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়ার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।

আমি থমকে থেমে দাঁড়ালাম। কোথায় একটা সাদৃশ্যবোধ হয় বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়খানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরাক্ত মেঘ ভেসে ওঠে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝাপটা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না? ওই কালো আকাশের বড় আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ-জড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক কবে লকলক করে বয়ে যাবে?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।